ই লি রি য়া না

কাজী জহিরুল ইসলাম

বিরহী নারীর মতো ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে উঠছে মুরোভি। বৃষ্টির ছাট আর সেই সঙ্গে দমকা হাওয়ায় কিছুতেই ছাতা সামলাতে পারছে না ইলিরিয়ানা। একসময় ডিমের খোসার মতো মচমচ শব্দ করে ডাঁসাগুলো ভেঙে গিয়ে উল্টে যায় ওর তিন ডয়েশ মার্কের ছাতাটি। এরপর বৃষ্টির ঝাপটা এসে লাগে চোখে-মুখে। এপ্রিলের শেষ হলেও বেশ ঠান্ডা পড়েছে আজ। ছাতার হাতলে চেপে বসা ওর আঙুলগুলো ঠান্ডায় অবশ হয়ে এলে ডাঁসাভাঙ্গা ছাতাটি বাতাশের তোড়ে ইলির হাত থেকে ছুটে গিয়ে কিছুক্ষণ ঘুড়ির মতো উড়তে থাকে, তারপর গোত্তা খেয়ে পড়ে রাস্তার ওপারের বাড়িটির একটি আপেল গাছের ওপর। বৃষ্টির কণাগুলি সুঁচের ডগার মতো ওর মুখে ঘাই মারছে। তারপরেও ভালো লাগে ইলির। ও জানে তিন মার্ক দিয়ে আরো একটি ছাতা কেনার সামর্থ নেই ওর। তবুও মন খারাপ হয় না। এই বৃষ্টিটা ওদের দরকার। মুরোভির এই কান্না কষ্টের না, আনন্দের। অন্ধকার হয়ে আসা আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়। হঠাৎ জ্বলে ওঠা বিদ্যুচ্চমকের আলোয় ইলির একটি সর্পিল ছায়া তৈরী হয়।

মাঠ ফেটে চৌচির। পাহাড়ের ঢালে ঢালে যেখানে দিগন্তজোড়া গম আর ভুট্টার ক্ষেতের ওপর দিয়ে হেলে-দুলে বয়ে যেতো বসন্তের দুরন্ত পাহাড়ি হাওয়া সেখানে এখন যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন। পোড়ামাটি জুড়ে ভাঙা গাড়ি, ল্যান্ডমাইনের ধ্বংসাবশেষ, ভাঙা দালানের টুকরা, মানুষ ও পশুর মাথার খুলি, আরো কত কী। বিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে সাপের মতো এঁকে বেঁকে ছুটে যাওয়া পথ ধরে চলতে থাকা গাড়ির জানালার কাচ খুলে এই এপ্রিলে ছেলেমেয়েরা মুখ বের করে দিতো বসন্তের নাতিশীতোষ্ণ হাওয়ায়, ওদের চুলে বিলি কাটবার জন্যে। আর এখন সেইসব প্রান্তর জুড়ে এপ্রিলে বইছে খুলির ভেতর দিয়ে, ধ্বংসপ্রাপ্ত দালানের ফোকর দিয়ে, বিদ্ধস্ত গাড়ির বনেটের ভেতর দিয়ে ছুটে আসে প্রেতের নিঃশ্বাস।

যুদ্ধের সব ক্ষতচিহ্ন ধুয়ে যাক, কষ্টের সব ক্ষত মুছে যাক এপ্রিলের বৃষ্টিতে। কাঁদো মুরোভি, চোখের জলে ধুয়ে ফেলো শরীরের পাপ। মুখের ওপর থেকে ধীরে ধীরে ওর কালো ওভারকোটের ভেতরে ঢুকে পড়ে বৃষ্টির ধারা, শুদ্ধতার স্রোত। দূর পাহাড়ের পা ধুয়ে ছুটে আসা শীর্ণ মুরোভি হঠাৎ থেমে পড়ে ভিটিনার নাকের তিলক, অর্থডগস চার্চটির কাছে। যেখানে কেফোরের মর্কিন সৈনিকেরা অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র হাতে পবিত্রতা রক্ষা করছে উপাসনালয়ের। তারপর পুনরায় ছুটে চলে ভিটিনার শরীর চিরে পোজরানের দিকে। ইলিরিয়ানার স্তন ভিজে উঠলে শরীরে কাঁপুনি আসে, স্তনের বোঁটা চিমসে শক্ত হয়ে যায়। ওর শাদা শার্টের বুকে দুটি আধফোটা বেলি ফুলের কলি ক্রমশ স্পস্ট হয়ে ওঠে। ওভারকোটের বোতাম খোলা বলে তা স্পস্ট দেখা যাচ্ছে। স্তনের ঢাল বেয়ে বৃষ্টির ধারা আস্তে আস্তে নেমে আসে নাভিতে, তারপর আরো গভীরে।

মুরোভি গর্জে ওঠে এবার। পাথরে আছড়ে পড়ে পাহাড়ি স্রোত। সেই স্রোতে ভাসতে থাকে ইলিরিয়ানা। ভেসে যায় ওর ওভারকোট, হাতের গ্লাভস, মাথার টুপি। খরস্রোতে ছিঁড়ে যায় শার্টের বোতাম, ব্রার হুক। উথাল-পাথাল ঢেউয়ের ভেতর থেকে হিসহিস করতে করতে বেরিয়ে আসে ভয়ানক সাপ। ছোবল মারে ওর কৈশোরে। তীব্র ক্রোধে ভয়ানক সাপটি কামড়াতে থাকে ওর ফর্শা স্তন, ঈষৎ লালচে বৃত্ত, বৃত্তের বোঁটা। বিষে নীল হয়ে ওঠা ইলিরিয়ানার পান্তালুন ছিঁড়ে ফেলে গোখরো; মহানন্দে লাজ নাড়ায় কুমারীর অরক্ষিত দূর্গে।

সর্বনাশের এখানেই শেষ না। সেই রাতে ইলিরিয়ানার অন্য দু'বোন আরদিয়ানা এবং আরবানাও ধর্ষিতা হয়। ইলিরিয়ানা জানে এমন কোন আলবেনিয়ান বীরপুরুষ নেই পুরো কসোভোতে যে ওদের তিনবোনের কাউকে বিয়ে করতে এগিয়ে আসবে। পরবর্তি তিনমাসে আরো দুবার ধর্ষিতা হয় ইলিরিয়ানা। অন্য দু'বোনকে নিয়ে ওর বাবা-মা তিরানায় চলে যায় এক দূরাত্মীয়ের কাছে। ইলিরিয়ানা তখন ডেসপারেট। নারীর সম্ভ্রম গেলে আর কিছুই থাকে না আলবেনিয়ান সমাজে। সুতরাং সে সিদ্ধান্ত নেয়, উচেকায় যোগ দেবার। প্রতিশোধ স্পৃহা ওর সমস্ত শরীরে ক্রোধের আগুন জ্বেলে দেয়।

আর কতদূর দ্রেনিৎসা? দ্রেনিৎসাই তখন তীর্থ ইলিরিয়ানার। রক্তের লাল দ্রিনে সাঁতরে ওকে দ্রেনিৎসায় পৌঁছতেই হবে। আদেম ইয়াশরের হাতে চুমু খেয়ে বুকে তুলে নিতে হবে প্রতিশোধের কালাশনিকভ। একটা একটা করে সার্বিয়ান কুকুরের খুলি উড়িয়ে দেবার প্রতিশোধ স্পৃহায় যখন টগবগ করে উঠছে ইলিরিয়ানার ধমনীর শিরা-উপশিরা তখনো ও জানে না, শত্রুর বীজ বহন করছে সে নিজেই।

হালকা হয়ে এসেছে বৃষ্টির ছাট। মেঘ কেটে গিয়ে আকাশ ফর্শা হয়ে উঠছে। ততোক্ষণে বৃষ্টির শীতল ধারাটি ওর উরুসন্ধির পাপ ধুয়ে নেমে গেছে মুরোভির বুকে। আর ফুসতে ফুসতে মুরোভি এগিয়ে চলেছে পোজরানের দিকে। চার্চের সামনে এসে কেফোরের বন্দুকের মুখে থামতে হলো ওকে। ওর গায়ে হাত দেয় না কেফোর। চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখে, তারপর যেতে বলে ওরা আরেকজনকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ইলিরিয়ানা পা বাড়ায় শহরের দিকে। এখান থেকে মুরোভি বাঁক নিয়েছে বাঁ দিকে আর ওর রাস্তা ডানে। ডান দিকে পা বাড়িয়ে নিজেকে কেমন অসহায় লাগে ইলির। এতোক্ষণ ওর একজন সঙ্গী ছিল। ছোট্ট নদী মুরোভি ছলছল করে ওর পাশাপাশি বয়ে চলতে চলতে যেন কত কথায় কত গল্পে ওর সাথে খলবল করে উঠছিল। এখন ও একা। স্যাঁতস্যাঁতে রাস্তার বিটুমিন খসে গেছে। বোমার আঘাতে পাথর-মাটি উড়ে গিয়ে তৈরী হয়েছে বড় বড় এক-একটা গর্ত। অতি দ্রুত ছুটে যাওয়া হঠাৎ একটি জলপাই রঙের জীপের চাকা এমনি খানাখন্দে আছড়ে পড়তেই গর্তে জমে থাকা কাদা-পানি ছিটকে উঠতে থাকে। তারই এক পশলা ছলকে এসে ইলিরিয়ানার ওভারকোটে ঝাপটা মারে। কাদা-পানিতে গায়ের জামা-কাপড় মাখামাখি। শরীরের ভাঁজে ভাঁজে জমে থাকা দীর্ঘ পথের ক্লান্তি, সেই সাথে বৃষ্টির পানি আর রাস্তার কাদা মিশে একাকার হয়ে গেছে। বৃষ্টি থেমে গেলেও দমকা বাতাশটা এখনো আছে। হাওয়ার তোড়টা হঠাৎ বেড়ে গেলেই শীতের কাঁপুনিটা এখন হাঁড়ে গিয়ে লাগছে। এতোক্ষণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি উঁকি দেয় ওর মস্তিস্কের জানালায়। কোথায় যাচ্ছে ও? ইলির মা বাবা আর বোনেরা কি তিরানা থেকে ফিরে এসেছে? গত এক বছরে ওদের কি হয়েছে না হয়েছে তার কিছুইতো ও জানে না। ওরা কি তিরানাতেই ছিল এই এক বছর? নাকি ওখান থেকে অন্যান্য শরণার্থিদের মতো ইউএনএইচসিআর-এর সহায়তায় পাড়ি জমিয়েছে অন্য কোন দেশে? বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে ইলির। ওইতো ওদের ঘরের চালাটা দেখা যাচ্ছে। লাল টাইলস মেঘের ফাকে উঁকি দেওয়া বৃষ্টিস্নাত সূর্যের স্নিগ্ধ আলোয় ঝলমল করছে। ওর পা ভারি হয়ে ওঠে। কত মাইল মাইল পথ পাড়ি দিয়ে, কত ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে কত দূর থেকে যে ও আসছে বুঝি এতোক্ষণে তা টের পেল ইলিরিয়ানা। ওর পা দুটি ক্রমশ অবশ হয়ে আসছে। বুঝি এটুকু পথ পাড়ি দেওয়া ওর পক্ষে আর কিছুতেই সম্ভব নয়। এমন সময় পেছন থেকে কে একজন দ্রুত ছুটে এসে ওকে ধাক্কা মারে।

এই মেয়ে ছয়টা থেকে কার্ফিউ, ভুলে গেছো? আর মাত্র পাঁচ মিনিট আছে। নাকি তোমার ঘড়ি ঘুরছে না?

তাই বুঝি, এই শহরে ছয়টা থেকে কার্ফিউ? এবার সম্বিৎ ফিরে আসে ওর। দ্রুত পা চালায় লাল টাইলস বরাবর।

কাঠের গেইট গ্যলভানাইজড আয়রণের তার দিয়ে একটা গাছের সঙ্গে আটকানো। গেইট খুলে ভেতরে ঢোকে ইলি। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন কতগুলো খুচরো পয়সার মতো ওর শৈশব-কৈশোর ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দ করে ঝরে পড়ে ওর শরীর থেকে। ইলিরিয়ানা অতি যত্নে তা কুড়িয়ে নেয়।

একটা লাল বল নিয়ে রোজ ওদের আপেল বাগানে খেলতে আসে বেসনিক। একই বয়স ওদের। আরদিয়ানা এবং আরবানা ওর চেয়ে এক বছরের ছোট জমজ দুই বোন। বেসনিক ওদের তিন বোনেরই স্বপ্নের রাজপুত্র। বেসনিকও পেয়েছিল বেছে নেবার সুযোগ। কখনো ও বেছে নিতো ইলিরিয়ানাকে, কখনো আরদিয়ানাকে আবার কখনো আরবানাকে। চারজনের এই দলে বেসনিকই ক্যাপ্টেন। খেলা নিয়ন্ত্রিত হত বেসনিকের ইচ্ছাতেই। খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে গেলে ওরা তখন বড় নাশপাতি গাছটার নিচে বসে গল্প করতো। কতো সব আজে-বাজে গল্প, এখন মনে হলে খুব হাসি পায়। আরবানা দেখতে ওদের তিনবোনের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী ছিল। ওই বয়সেই বেসনিক সুন্দরের পার্থক্য বুঝে ফেলেছিল। ও বেশিরভাগ সময়ই আরবানার গলা জড়িয়ে ধরে হাঁটতো। মাঝে মাঝে ওরা আঙুরের ঝোপের মধ্যে হারিয়ে যেত। এ নিয়ে আরবানাকে অন্য দুবোন কি খেপাতো। ওরা কি চুমু খেত? ইলিরিয়ানা তা কখনো দেখার চেষ্টা করতো না। আরবানার সাথে বেসনিকের এতো ঘনিষ্ঠতা দেখে ইলি মুখে হাসি টেনে আনলেও ওর আসলে তখন ঈর্ষায় বুক পুড়ে যেত। সেই প্রথম ইলিরিয়ানা টের পায় কারো বউ হবার স্বপ্ন দেখেছিল ও। ওর সেই স্বপ্নের মুলধন লুটে নিয়েছে সার্বিয়ান শুয়োরেরা।

দরোজা খুলে অচেনা মানুষের মতো তাকিয়ে থাকে শুকরিয়ে। অনেকক্ষণ পর শুধু 'ইলি' বলেই তিনি আবার বোবা হয়ে যান। মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে ইলিরিয়ানা। কত ঝড়ের ক্ষতচিহ্ন সেখানে। মাথায় প্রিন্টের স্কার্ফ, পরনে অসংখ্য কুচি দেয়া কুলা আর একটি ফ্লানেলের ফুলহাতা পুরোনো জামা। কুলার প্রতি কুচিতে কুচিতে যেন একেকটি শোকগাঁথা বহন করছেন শুকরিয়ে। সেইসব শোকের ভারে তিনি ন্যুব্জ হয়ে আছেন।

'ননা' বলে অনেকক্ষণ পর মায়ের বুকে ঝাপিয়ে পড়ে ইলিরিয়ানা। ততোক্ষণে অন্য দুবোন পাশের ঘর থেকে ছুটে এসে নীরব কান্নায় শামিল হয়। যেন এ কান্নায় যোগ দিয়ে ওরা একে অন্যের কষ্টকে ভাগ করে নিচ্ছে। যেন ওদের মিলিত কান্নার স্রোত এতোদিন পর খুঁজে পেল প্রার্থিত মোহনাটিকে। এতোদিন পর মেয়েকে ফিরে পেয়ে শুকরিয়ে কি খুশি হননি? ওর মুখে থমথমে মেঘ। বৃষ্টির তেমন কোন সম্ভাবনা নেই সে মেঘে। ফেরারী মেঘ শুধু আকাশে আকাশে ঘুরে বেড়ায়। কখনো নেমে আসে না মাটির পৃথিবীতে। শুকরিয়ের মুখ থেকে শোকের ঘন মেঘ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে আরদিয়ানা ও আরবানার মুখে এবং শেষ পর্যন্ত ইলিরিয়ানাকেও আক্রান্ত করে সেই মেঘ।

মেঝের কার্পেটে বেশ বড় একটা গর্ত। ওখানে হোচট খায় ইলিরিয়ানা। ওপরে তাকিয়ে দেখে টাইলসের ফুটো দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। সে আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ, তারই ফাকে নীল ছড়ানো। ইলি বুঝতে পারে ওই ফুটো দিয়েই তুষার গলা জল পড়েছে কার্পেটে। আর তুর্কি কার্পেট পচে গিয়ে তৈরী হয়েছে এই গর্ত। আকাশের নীলে বেশীক্ষণ তাকায় না ইলি, চোখ নামিয়ে আনে। শুকরিয়ে ততোক্ষণে পাশের ঘরে চলে গেছে। হাজারটা প্রশ্ন নিয়ে আরদিয়ানা এবং আরবানা তাকিয়ে আছে ইলিরিয়ানার চোখের দিকে। ওদের সকল প্রশ্ন ছাপিয়ে ইলির প্রশ্নটিই মুখ্য হয়ে ওঠে। ওরা সে প্রশ্ন বুঝতে পেরে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। ইলিরিয়ানার শূন্য, ফ্যাকাশে দৃষ্টি ওকে ছেড়ে বেরিয়ে যায় এ ঘর থেকে। সমস্ত বাগান, যার প্রতি পরতে লেগে আছে ওর বাবার মমতার চিহ্ন, প্রদক্ষিন করে ওর দৃষ্টি এসে স্থির হয় কাঠের গেইটের বাইরে, যেখানে তাজা গোলাপ দিয়ে সাজানো শুভ্র তোয়ালের নিচে রাখা একটি শূন্য চেয়ার। এর অর্থ ইলের সম্প্রদায়ের সকলেই জানে, এ বাড়িতে একটি আসন শূন্য হয়েছে।

আর কত বিধ্বস্ত হতে হবে এই পরিবারটিকে? একেকটি মানুষ যেন একেকটি শোকের স্তম্ভ, স্থির, অনড়। ভারী আর গুমোট আবহাওয়া ছাপিয়ে ওর জমজ দুই বোনের চোখে কিঞ্চিৎ কপট চটুলতা দেখে ইলি।

মাকে জিজ্ঞেস করতে সাহস পায় না ইলি, বাবার মৃত্যুর কারণ। যুদ্ধের শুরুতেই তিনি ব্রঙ্কাইটিসে ভুগছিলেন।

কাগজের মতো পাতলা কয়েক টুকরো কাঠে গ্যাস লাইটার জ্বালিয়ে উনুন ধরালেন শুকরিয়ে। শুকনো কাঠে ধা ধা করে আগুন জ্বলে উঠলো। এ আগুনে কি পোড়ে? পেটের ক্ষুধা? কষ্ট পোড়ে না? জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে না এ পরিবারের সব জমাট কষ্ট? ভেতরের কান্না ভেতরেই চেপে রেখে কাঠের উনুনে কষ্ট পোড়াতে থাকেন শুকরিয়ে। চোকোনো উনুনের ওপরে ধাতব পাত, তার ওপরে একটি পাত্রে দুই লিটার পানি চড়িয়ে কাবার্ড হাতরাচ্ছেন শুকরিয়ে। কিছুই যেন খুঁজে পাচ্ছেন না, এই রকম একটি বিরক্তির অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে ওর কপালের অসংখ্য ভাঁজে। উনুনের পেছন দিক থেকে হাতির শুঁড়ের মতো একটি ধোয়ার পাইপ উঠে গেছে টাইলস ফুড়ে ছাদের চিমনিতে। বিজলিমি পরিবারের কষ্ট পোড়া ধোঁয়া তা দিয়ে বেরিয়ে মুক্ত আকাশে উড়তে শুরু করেছে।

নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না ইলিরিয়ানা। দৌড়ে কিচেনে ঢুকতে হিয়ে দরোজার কাছে রাখা আবর্জনার বিনটি উল্টে দেয়। তারপর পেছন দিক থেকে মাকে জাপটে ধরে। সমস্ত শরীরে মাতৃত্বের কম্পন অনুভব করলেও কেন যেন মেয়ের মুখোমুখি হতে চাইছেন না শুকরিয়ে। তুমি বিশ্রাম নাও মা, আমি স্যুপ রান্না করি। খুব সহজেই প্রস্তাবটা মেনে নেন শুকরিয়ে। ফ্রিজ থেকে লিক আর লেটুশ পাতা বের করে দিয়ে যেন নিজেকে এড়াতেই তিনি অন্য ঘরে পা বাড়ান। ইলি দেখে ওর মায়ের পা দুটো যেন আরো ভারী হয়ে উঠেছে। পায়ে কি পানি নেমেছে? কুলার নিচ দিয়ে যেটুকু বেরিয়ে আছে, গোড়ালি অব্দি ফুলে ঢোল হয়ে আছে।

অন্য ঘরে ঢুকেই ছোট দুই মেয়েকে আচ্ছা করে বকা লাগান শুকরিয়ে। ওরা জানালা খুলে দিয়েছে। হু হু করে ঠান্ডা বাতাশ আসছে বাইরে থেকে। অশুভ শৈত্যপ্রবাহ পর্যাপ্ত শীতবস্ত্রের অভাবটাকে চাগিয়ে তুলেছে। চাপা ক্ষোভ ছোট দু'মেয়ের মধ্যেও। ওদের উনিশ বছরের বাড়ন্ত শরীরে সেই ক্ষোভের ছায়া পড়ে। জ্যুশার দোহাই দেয় ওরা। ভুলে গেছো ননা, জ্যুশা কি বলতেন? বসন্তের শুরুতে দরোজা-জানালা খুলে দিতে হয়, বলে আরবানা। আরদিয়ানা যোগ করে তাতে, তা না হলে ঘর থেকে কষ্ট যায় না। অশুভ শীতের মতো কষ্টের দানব ঘরে বাসা বাঁধে পুরো বছরের জন্য। শুকরিয়ে

ভোলেন নি শ্বাশুড়ির একটি উপদেশও। শ্বাশুড়ি ছিলেন শুকরিয়ের পরম পূজনীয় গুরুজন। শ্বশুড়-শ্বাশুড়িকে সম্মান করা আলবেনিয়ান সমাজের রীতি, শুকরিয়ে সেই রীতি একটু বেশিই পালন করতেন। ওর বিধবা শ্বাশুড়ি জেবাহিরে ছিলেন সময়ের চেয়ে আধুনিক। তার রুচি জ্ঞান ছিল অতি উচ্চ পর্যায়ের। তিন নাতনীকে তিনি ভেরা (গ্রীস্মকাল)-র জ্যোৎস্না রাতে জেনাতের গল্প শোনাতেন। গল্প শোনাতেন লাল গ্রহের। জেনাতের গল্প শুনে, হুর-গেলমানের কথা শুনে, উষ্ণ বিছানার কথা শুনে যখন তিন নাতনী আনন্দে ওয়াও করে উঠতো তখন তিনি বলতেন, জেনাত খুঁজতে তোমাদের বহু দূরে যেতে হবে না, পৃথিবীতেই জেনাত আছে। শুনতে চাও সেই জেনাতের কথা? পৃথিবীতে এমন একটি জায়গা আছে যেখানে মানুষ খুঁজে পায় জেনাতের ছায়া। যদের (ঈশ্বর) প্রিয় সেই জায়গায় পালাক্রমে চার ঋতুর আবির্ভাব ঘটে। ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত শীতকাল। তখন তুষার শুভ্র শীতে আকাশ থেকে ঝরে পড়ে সুগন্ধী পরীর নিঃশ্বাস।

এরপর তিনি আকাশ থেকে পূর্ণিমা রাতে ভেজা জ্যোৎস্না ঝরে পড়ার অভূতপূর্ব দৃশ্যের বর্ণনা করেন অনেকক্ষণ ধরে। যতদূর দৃষ্টি যায় পাহাড়ের বিস্তীর্ণ ঢালে, মেঘের চুমো খাওয়া চূড়োয়, ঢেউয়ের মতো দোল খাওয়া পাহাড়ে, জলে, সমতলে বিছিয়ে থাকা অবারিত তুষারের দুধ শুভ্র চাদরের ওপর জ্যোৎস্না ঝরে পড়ার অনিন্দ্য সুন্দর দৃশ্যের বর্ণনা করতে গিয়ে জেবাহিরের মুখে নেমে আসতো এক অপার্থিব সৌন্দর্যের ছায়া। ওরা তিন বোন তখন মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে থাকতো জ্যুশার মুখে দিকে। যেন দাদীর মুখেই সেল্যুলয়েডের ফিতের মতো খেলা করছে স্বর্গের দৃশ্যপট। অপর্থিব এক স্বর্গের বর্ণনা শুনে ওরা ভুলে যেতো অশুভ শীতের কষ্ট। হিমাঙ্কের কুড়ি ডিগ্রী নিচে নেমে যাওয়া তাপমাত্রায়ও ওরা জ্যুশার গল্পের পরী হয়ে উড়ে বেড়াতো পাহাড় থেকে পাহাড়ে, আলতো পায়ে হেঁটে বেড়াতো বিস্তীর্ণ প্রান্তর ঢেকে রাখা এক দুধসমুদ্র শুভ্র তুষারের ওপর দিয়ে।

এরপর জ্যুশার জেনাতে হামাগুড়ি দিয়ে নেমে আসে প্রাণভেরা। এপ্রিল-মে, মাত্র দু'মাসের ক্ষণস্থায়ী বসন্ত ঋতু। আঙুরের, আপেলের, চেরীর, স্ট্রবেরির, রাস্পবেরির, ব্ল্যাকবেরির, পিচের, নাশপাতির মরা ডালে বসন্তের ছোঁয়া লাগতেই কচি সবুজ পাতায় ভরে ওঠে স্বর্গের উঠোন। মরা ডালে শুরু হয় সবুজের দাপাদাপি-হুড়োহুড়ি। বরফের নিচ থেকে আঁড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠতে থাকে পাহাড়সমূহ। মাথার চুল ঝেরে সোজা হয়ে দাঁড়ায় পাইনের বন। বসন্তের শুরুতেই ঘরের সব দরোজা-জানালা খুলে দিতে হয়। শীতদেবীর ভয়ে যেসব অশুভ শক্তি, রোগ-শোক ঘরের কোনায় কোনায় বাসা বেঁধেছিল, এ সময় ওরা খোলা জানালা দিয়ে, খোলা দরোজা দিয়ে ছুটে পালায়। জেনাতের ত্রিসীমানা পেরিয়ে দূর পাহাড়ের ওপারে, নরকের কালো জলাশয়ে গিয়ে ঝাপ দেয়।

রিলে রেসের মতো জুনের শুরুতেই আকাশ থেকে নেমে আসে ভেরা। আর ততোদিনে বুড়ো হয়ে আসা ক্লান্ত প্রাণভেরা ঋতুবৈচিত্রের পতাকাটি তুলে দেয় ভেরার হাতে। অমনি সেটা রঙ বদলে হয়ে ওঠে গাঢ় সবুজ। গ্রীস্মের তারুণ্যকে ভয় পেয়ে জলদি পালায় প্রাণভেরা। ডালে ডালে তখন আঙুরের, আপেলের, নাশপাতির, আরো আরো সব বিচিত্র ফলের সবুজ ঘন হয়ে আসে, ভারী হয়ে আসে। বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে ক'দিনের মধ্যেই শুরু হয় ভূট্টা আর গমের কনসার্ট। টমেটোর ক্ষেত গর্ভবতী নারীর মতো আয়েশী-বিলাসী হয়ে শুয়ে পড়ে। বাঁধাকপি জমাট বাঁধে কিশোরীর স্তনের মতো। ভেড়া-মহিষের পাল পাহাড়ের ঢালে ঢালে খুঁজে পায় সবুজের মিষ্টি স্বাদ। আর পাহাড়ের ঢালে, কোন ছুটে যাওয়া ঝর্ণার পাশে, পাইনের বনের ছায়ায় ছিপছিপে শরীর এলিয়ে দিয়ে বিশ্রামে চোখ বোঁজে স্বর্গের বারিশ (রাখাল বালিকা)। ওর অবিশ্রান্ত স্কার্টের কার্নিশ টেনে নিয়ে যায় একদল ফেরেশতা। প্রসারিত স্কার্টের কার্নিশ ঝুলে পড়ে পাহাড়ের ঢালে। তারই ছায়ায় ঢাকা পড়ে কাঁজু বাদামের বন, ঝর্ণার স্বচ্ছ জলধারা, বৃষ্টিস্নাত সবুজ ঘাসের ডগা। আর স্কার্টের কার্নিশ বেয়ে চড়ে বেড়ানো ভেড়া-মহিষের পালটিকে পরম মমতায়, মাতৃত্বের স্নেহে আগলে রাখে স্বর্গের বারিশ।

এ সময় আলুর ক্ষেত ফুলে ওঠে। গর্ভবতী নারীর পেটের মতো ফাটল দেখা দেয় আলুর ক্ষেতে। তারই ফাঁকে আলুর হাসি দেখে দাঁত বের করে স্বর্গের কৃষক। মাঠ ভরা রসালো বোস্তান (অতি সুমিষ্ট তরমুজ) তপ্ত দুপুরে ক্লান্ত পথিকের অমিয় উপহার। আপেলের ডাল থেকে দুপুরের রোদের ওপর দিয়ে ভেসে আসে ঘুঘুর সুরেলা সঙ্গীত। দালানজুশা (আবাবিল) পাখি সারক্ষণ উড়ে বেড়ায় স্বর্গের সুনীল আকাশে। আর পাহাড়ের ঢালে, হঠাৎ বিস্তীর্ণ সমতলের বুক চিরে সাপের মতো এঁকেবেঁকে ছুটে যাওয়া পিচঢালা পথের দু'পাশে অযত্নে বেড়ে ওঠা হলুদ, লাল আর শাদা বুনো কসমসের মনোলোভা সুবিশাল গালিচা সন্ধ্যার মৃদু বাতাশে দোল খায় লেলেকোর ডানার মতো। সেই ঢেউয়ে দুলে ওঠে নার্সিসের পাপড়ির মতো মসৃণ ত্বকের তন্বী তরুণীদের কোমল হৃদয়। সারি বেঁধে স্বর্গের রাস্তায় ওরা হেঁটে বেড়ায়। ওদের গা থেকে ভেসে আসে বুনো ফুলের সুবাস। সেই সুবাসে ঘ্রাণ নেয় স্বর্গের পূণ্যবান যুবকেরা, পান করে রাকিয়ার মদির নেশা।

গ্রীস্মের সন্ধ্যা ফিকে হয়ে এলে পাহাড় থেকে হামাগুড়ি দিয়ে নেমে আসে শরৎকাল। ঠান্ডা এবং গরম জলের আরামদায়ক মিশ্রণের মতো নাতিশীতোষ্ণ হাওয়া বইতে থাকে এ সময়। প্রকৃতি তখন জামার রঙ বদলায়। হলুদাভ, লালচে আভায় বিকির্ণ হয় স্বর্গের বাগান। তখন গম, ভূট্টা ঘরে তুলে কৃষক অলস গড়াগড়ি দেয় ফোমের বিছানায়। গৃহিনীরা নতুন গমের ময়দা দিয়ে তৈরী করে গরম গরম প্যানকেক, ফ্লি, পিতা, বুক, ভেড়ার দুধের পনির দেয়া বোরেক আরো কত কি।

এভাবে চার ঋতুর বর্ণনা শেষ করে জেবাহিরে বলতে শুরু করেন স্বর্গের বৈশিষ্ট্য।

তোমরা কি জানো স্বর্গের বৈশিষ্ট্য কি? স্বর্গ হচ্ছে এমন একটি স্থান যেখানে একদিকে যেমন আছে শুভ্র তুষার ধোয়া স্নিগ্ধ শীতকাল, তেমনি আছে সূর্যের চুমু খাওয়া গ্রীস্মের উষ্ণতা। একদিকে আকাশছোঁয়া পর্বত যেমন আছে, তেমনি রয়েছে বিস্তীর্ণ সমতল, সবুজের গালিচা। মরুর লু হাওয়া যেমন আছে, তেমনি আছে মিষ্টি সরোবর। এখানে বৃষ্টি হয়, তুষারপাত হয়, গাছ থেকে ঝরে পড়ে হলুদ পাতা, আপেল, নাশপাতি, আঙুর, কাজু বাদাম আর রক্তের মতো লাল চেরীফল। স্বর্গের আকাশে উড়ে বেড়ায় দালানযুশা, লেলেকো (এক ধরণের ধনেশ পাখি), ঘুঘুৎকা (ঘুঘু), বহুরঙা ব্রেমচে (চড়ুই), শান্তির বার্তাবাহী গ্লুবা (পায়রা), সুকণ্ঠী ধুসর-শুভ্র ছড়ড়া (কাক) আরো বিচিত্র সব পাখি। বাগানে বাগনে ফুটে থাকে নানা বর্ণের টিউলিপ, রডেডেনড্রন, গোলাপ, কসমস, আই-ফ্লাওয়ার, জামাক আরো কতো জানা-অজানা ফুল। আর ফুল থেকে ফুলে উড়ে বেড়ায় হলুদ, শাদা, নীল আর আকাশী রঙের ফ্লুৎরা (প্রজাপতি)।

এরপরই জেবাহিরে বলেন তার গল্পের মূল রহস্য বা উদ্দেশ্যটির কথা।
সেই স্বর্গটি কোথায় তোমরা কেউ কি জানো কন্যারা?
ওরা তিনবোন জ্যুশার এ প্রশ্নে থিয়েটারের মানুষদের মতো মাথা দুলিয়ে বলে, ইয়ো ইয়ো (না, না)। আর তখনি জেবাহিরের মুখে নেমে আসে স্বর্গের দ্যুতি। তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে আনন্দাশ্রু। তিনি তার সমস্ত আবেগ দিয়ে হৃদয়ের খুব গভীর থেকে বলেন, সেই পার্থিব স্বর্গটির নাম হলো কসোভা। তোমাদের, তোমাদের পিতার, তোমাদের পিতামহের, সমগ্র ইলের সম্প্রদায়ের, পেলাসগ সম্প্রদায়ের প্রাণের চেয়ে প্রিয় পিতৃভূমি, আমাদের সকলের প্রিয় জন্মভূমি কসোভা।

দূরে দাঁড়িয়ে এ গল্প শুনতে শুনতে শুকরিয়ের চোখে-মুখেও উদ্ভাসিত হতো স্বর্গীয় আনন্দের দ্যুতি। মনে পড়ে যেত বেকিম বিজলিমির ঘরে ওর বউ হয়ে আসবার দিনটির কথা। স্বর্গের পথ ধরেইতো শুকরিয়ে আসছিলেন বেকিমের ঘরে। স্মিরা থেকে ভিটিনা মাত্র সাত কিলোমিটার পথ। বেকিমের হাতে শুকরিয়েকে তুলে দিয়ে ইজেত হোজ্জা কি চোখের পানি ফেলেছিলেন? হয়ত দু'ফোটা আনন্দাশ্রু গড়িয়ে থাকবে ওর গাল বেয়ে। তেইশ বছর আগের সেই দৃশ্য এখন আর মনে নেই শুকরিয়ের। শুধু মনে আছে উনিশ বছরের আগুন ওর শরীরে।

ইউগো সেভেন্টি-ফাইভ মডেলের একটি ঝকঝকে শাদা গাড়ির পেছনের সিটে ওর পাশে বসে সেই আগুনে পুড়ে মরছে বেকিম বিজলিমি। দুঃসাহসী শুকরিয়ে সেই অচেনা যুবকের বুকের কাঁপন থামাতে যেন অজান্তেই ওর ডান হাতটি তুলে দেয় বেকিমের উরুতে। প্রশ্রয় পেয়ে বেকিমও ওর বাঁ হাত তুলে দেয় শুকরিয়ের কোলের ওপর। সামনে-পেছন এ স্বর্গীয় আনন্দযাত্রার সহযাত্রী আরো ১৮টি প্রাইভেট কার। বেকিমের বোনেরা, চাচাতো, খালাতো, মামাতো, ফুপাতো বোনেরা, অবিবাহিতা খালা-ফুপুরা প্রতিটি গাড়ির জানালা দিয়ে নিজেদের কোমর অব্দি শরীর শূন্যে বের করে আকাশে-বাতাশে ছন্দে ছন্দে দোলাচ্ছে একটি করে শাদা রুমাল। আলবেনিয়ান সমাজে ক্রুশযাত্রায় (বরযাত্রা) এভাবেই আনন্দ প্রকাশের প্রথা। সবচেয়ে সামনে যে গাড়িটি, তার জানালায় উড়ছে লাল আকাশে উড়ন্ত শিপনঈয়াখচিত (দুই মাথাবিশিষ্ট ঈগল) আলবেনিয়ান পতাকা। ইস্কান্দার বে জিয়র্জি কাস্ত্রিয়তি, তুর্কি সেনাবাহিনীর এক আলবেনিয়ান সৈনিক, তুরস্ক থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে বহু দিন বহু রাত্রি পেরিয়ে এই পতাকাটি বহন করে এনেছিলেন আলবেনিয়ানদের জন্য। সেই থেকে বলকানের যেখানেই থাকুন না কেন, আলবেনিয়ান সম্প্রদায়ের এটিই জাতীয় পতাকা, ওদের প্রাণের পতাকা। বরযাত্রা, শোকযাত্রাসহ সকল শোভাযাত্রায় আলবেনিয়ানরা এই পতাকা বহন করে।

ওরা যখন খুব কাছাকাছি, শরীর দিয়ে মাপছিল একে অন্যের শরীরের উত্তাপ ঠিক তখনি ঘটে ঘটনাটি। বেকিমের সমবয়সী চাচা দ্রিতন গাড়ি চালাচ্ছিল, ওদের দিকে পেছন ফিরে চোখ টিপে দিয়ে ও আর সামনে তাকাতে পারেনি। বিকট চিৎকারে ভেঙে পড়ে শুকরিয়ে, দাঁত-মুখ খিচে নিঃশ্বাস বন্ধ করে বেকিম, দ্রিতন তখনো জানে না একটা লম্বা লরি ওর গাড়িকে ধাক্কা মেরে চলে যাচ্ছে। আকাশ ভেঙে পড়ে শুকরিয়ের ওপর। মুহূমুর্হূ বজ্রপাতে কাঁপতে শুরু করে ওর বুকের

ভেতর সযত্নে লালিত স্বপ্নের বাসরঘর। এ-কী হয়ে গেল। কোত্থেকে হঠাৎ এলো এই অপয়া লরি। এতো লম্বা এই ভারি যানবাহনটি কি করে দ্রিতনের নজরে এলো না?

ওদের স্বর্গীয় রথ ইউগো সেভেনটি-ফাইভ তিন পাক খেয়ে আবার ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভূট্টা ক্ষেতের ওপর। গাড়ির আটকে যাওয়া দরোজা খুলে ওরা যখন গড়িয়ে পড়লো ভূট্টা ক্ষেতের মাঝখানে তখন শুকরিয়ের বিয়ের শুভ্র পোশাকে অশুভ ক্ষতচিহ্ন, কালির আঁচড়। হিস্ট্রিরিয়াগ্রস্থ রোগীর মতো কাঁপছে ওর লকলকে লতার মতো নিভাঁজ শরীর। ওর কপালে এতোক্ষন ধরে নক্ষত্রখচিত যে সৌভাগ্যের উজ্জ্বল কুনরা (মুকুট) জ্বলজ্বল করছিল, অশুভ লরির ধাক্কায় তা খসে গেছে নক্ষত্রপতনের মতো। তুত গাছের পাতা খেয়ে রেশম পোকা যে অলৌকিক সুতো তৈরী করে তা দিয়ে তৈরী ওর তুষারশুভ্র বিয়ের দিমিয়া *(তুর্কি সমাজের প্রথাগত বিয়ের পোশাক। ৫০০ বছর তুর্কি শাসনামলে থাকাকালে আলবেনিয়ান মুসলিম সমাজের মেয়েদের বিয়ের পোশাক হিসাবে দিমিয়া গৃহীত হয়। ঘাঘরার মতো, অসংখ্য কুচি দেয়া শরীরের নিম্নাংশের পোশাক।)* ধুলো-কালিতে মাখামাখি। শুকরিয়ের সম্ভ্রমের ভেলা *(বিয়ের দিনের বিশেষ ঘোমটা)* কোথায় যে উড়ে গেছে, কোন ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে কে জানে? দিমিয়া উল্টে গিয়ে জিপনে *(দিমিয়ার নিচে পড়ার জন্য পেটিকোটের মতো এক ধরণের পোশাক)* বেরিয়ে পড়েছে কোথাও কোথাও। ইলেকের *(সোনার কাজ করা কটি জাতীয় পোশাক। তবে এটির বুক খোলা থাকে না বলে পরতে হয় পুলওভারের মতো। অতি মূল্যবান এ পোশাকটি মধ্যবিত্ত আলবেনিয়ান মেয়েরা জীবনে একবারই মাত্র পরে।)* সোনার কাজ উঠে গেছে কয়েক জায়গায়। গলার কাছটায় দুভাক (জামা বা টপস) ছিঁড়ে গিয়ে আঁচড় লেগেছে ওর শাদা গোলাপের পাপড়ির মতো নরোম গায়ে। টকটকে লাল রক্তের ক্ষীন ধারা একটু গড়িয়ে থেমে যাওয়ায় সেখানে কালচে দাগ তৈরী হয়েছে। গলার কাছে বেশ কয়েকটা কালসিটে তৈরী করেছে কলঙ্কের চিহ্ন। একপাটি জুতো কোথায় যে খসে পড়েছে কে জানে। শুকরিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে দুহাতে দিমিয়া তুলে ধরে। সদ্য মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে আসা ওর ভীত, সন্ত্রস্ত মুখমন্ডল ভিজিয়ে দিচ্ছে প্রবাহিত কান্নার ধারা। জীবনে আর কোনদিন শুকরিয়ের চোখ থেকে এতোটা জল গড়ায়নি। সেই থেকেই কি চোখের জলের সাথে শুকরিয়ের আত্মীয়তা? বেকিম কি জ্ঞান হারিয়েছিল? না। ভূট্টা ক্ষেতের ভেতর থেকে উঠে এসে ওর গায়ের কোর্টটি শুকরিয়ের কাধে চাপিয়ে দিয়ে পশ্চিমা ছবির নায়কদের মতো একটা লাকি-স্ট্রাইকে আগুন ধরায় বেকিম। চলে যাওয়া লরিটির ফেলে যাওয়া রাস্তায় শূন্য দৃষ্টি রেখে শুকরিয়েকে পাশ থেকে জড়িয়ে ধরে বেকিম, মুখে কোন কথা বলে না। নিজেকে খুব অসহায় লাগে শুকরিয়ের। এই অচেনা লোকগুলো ছাড়াতো আর কেউ নেই ওর সাথে। কেউ আসেনি ওদের বাড়ি থেকে, নিয়ম নেই বিয়ের পর কনের সাথে কেউ বরের বাড়িতে যাওয়ার।